লোকে কী বলে, আমরা কী বলি ?

খোন্দেকার দিলসাদ হক

[মূল প্রবন্ধ : 'ফেরিওয়ালি রেলগাড়িতে ইস্টিশনে' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মানবীচর্চা বিভাগে এম.ফিল. গবেষণাপত্ররূপে পূর্বে প্রকাশিত]

৯:২০-এর কল্যাণী লোকালটা আজ কেমন ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের সঙ্গে ঠিকঠাক মিলবনাকত হলে এখনই তো ছেড়ে যাওয়া উচিত।

অনুভব করলাম, ১০ বগির জড়ভরতটা একটু যেন নড়ে উঠল। 'ওরে নড়েছে রে নড়েছে'। গর্ভস্থ শিশুটা মায়ের পেটে একটু সচল হলেই মা যেমন আনন্দে শিহরিত হয়, এ' যেন সেই তেমনই সুখানুভূতি। হাপিত্যেশের ভঙ্গিমা ছেড়ে এবার তাই কামরাবন্দী মানুষগুলো একটু আশার আলো দেখে। এক ঝলকে হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে তক্ষুণি মনে মনে সময়ের লাভক্ষতির হিসাবটা কষে নেয় নিত্য এই পথে যাতায়াত করা মানুষগুলো। লাভের পাল্লাটা তাদের দিকেই ভারি হয় যারা আজ দু'এক মিনিট দেরি সত্ত্বেও কেবল বরাতজোরে ৯:২০ -এর কল্যাণী সীমান্তে পা রাখার জায়গাটুকু পেয়েছে। আর সময়ের দৌড়ে যারা খানিকটা এগিয়েছিল, একচিলতে জমির অস্থায়ী মালিকানা পাওয়ার মত করে তাদের দখলে এসেছে, একটু থিতু হয়ে বসার অধিকারটুকু। পরম এ'প্রাপ্তিযোগটা নেহাৎ একচেটিয়া নয়, তাই প্রতিদিনই সময় বদল, স্টেশন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার হাতও বদলাতে থাকে। জনাধিক্যের চাপে প্রশস্ত রেলবগিটা মাঝে মাঝে ছোট দেখায়। তবু মানিয়ে নেওয়ার প্রবল তাগিদ হতে অনাত্মীয় এই মানুষগুলো সাময়িক সহাবস্থানটার মধ্য দিয়েই নিজেদের মধ্যে আন্তঃআণবিক আর মানসিক ফাঁকটুকু কমিয়ে নেওয়ার দুরন্ত অভ্যাস গড়ে তোলে। গন্তব্য সবার এক নয়। সময়ের ব্যবধানে কেউ বা আগে নামে, কেউ বা পরে। এরই মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের যেন একটা মানসিক যোগ দৈরি হয়ে যায়। চেনা দুঃখ, চেনা সুখগুলো নিয়ে একে অন্যের আপাত সাহচর্যের পালা মিটতে - না মিটতেই গন্তব্য স্টেশনটা উঁকিঝুঁকি মারে। কেউ বা আবার সেইটুকু আলাপচারিতায়ও আগ্রহ প্রকাশ করে না। ১০ বগি নিয়ে ছুটে চলা ক্লান্তিহীন রেলগাড়িটার তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আর আসে যায় না তাদের, যারা এই রেলপথকে সম্বল করেই প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইটা জিইয়ে রাখে। রেল আছে, রেলের যাত্রী আছে, তাই ওঁরাও আছেন আমাদের মধ্যে পরম বাস্তব হয়ে, ওঁরা ''রেলগাড়ির হকার''।

আজ আর ওঁদের কেউ ফেরিওয়ালা কিংবা ফিরিওয়ালা বলে ডাকাডাকি করে না। যুগধর্মের সংগতিতে 'ফরিওয়ালা' শব্দটি কীভাবে যেন একটা আস্ত ইংরেজি শব্দের প্রবল পরাক্রমের কাছে পরাভব মেনে সরে দাঁড়িছেছে। 'হকার' কথাটা অনেক বেশি ব্যবহারিক ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে জনমানসে। 'ক্রেতা-বিক্রেতা' এই সম্পর্কের বৃত্ত ছাড়িয়ে তাঁদের নিয়ে কখনও তলিয়ে ভেবে দেখার অবকাশ আমরা পাই না। অথচ নিত্যকার এই যাত্রাপথে তাঁরা থাকেন আমাদের সঙ্গে। পুরণ করে সস্তায় কেনাকাটার বাঞ্ছা। ব্যস্ত কর্মজীবনে খানিকটা সময় আর শ্রমও বাঁচিয়ে দেন ক্রেতাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হাতের কাজে জুগিয়ে দিয়ে। শুধু শুনবার আর শোনাবার তাগিদে ওই মানুষগুলোর জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হয়ে চেয়েছিলাম সেদিন। কিছু অগোছালো সংলাপ-স্মৃতি নির্ভর তথ্য আর মৌখিক সূত্রকে পাথেয় করে যখন সবটুকু সাজালাম, অনেক অজানা সত্যের তল খুঁজে পেলাম।

দমদমে এসে ট্রেনটা একটু জিরোচ্ছে, এই সুযোগে গল্পটা শুরু করে দিই। ইছাপুরের মুন্নী বিবিকে আপনারা নিত্যযাত্রীরা চেনেন বইকী ! অবশ্য না চিনলেও ক্ষতি নেই। আলাপ করিয়ে দিই। বছর ৩৬-এর এই বিধবা মানুষটি প্রায় বারো বছর ধরে দমদম-নৈহাটি লাইনে ইমিটেশনের জিনিস ফেরি করেছেন। বাংলাভাষী নন, আদি বাড়ি ছিল লক্ষ্ণৌ। শৈশবের কথা খুব বেশি মনে নেই তাঁর। তবে মায়ের মুখে শুনেছেন, গত শতকের গোড়াতেই নানার হাত ধরে এই বাংলায় চলে এসেছিলেন ওঁরা। তারপর শ্যামনগরের গাড়ুলিয়ায় স্থায়ী বাসা। দুই বোন, দুই ভাই, আব্বা, মা, নানা, নানি বেশ বড় সংসার। পরিবারে রোজগেরে সদস্য বলতে ওঁর বাবা। মিলে চাকরি করেন। অভাব-অনটনের মধ্যই বড় হওয়া। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ মেলেনি। নিজের মুখে স্বীকার করেন যেন 'কোরান-হাসিদও' বিশেষ জানা নেই। মুন্নী বলেন, ওঁর কাজটাই ওঁর ধর্ম। তবে বড় মেয়েকে (দশ-একারো বছর বয়স) কোরান কেতাব পড়াচ্ছেন আর ছোটটাকে প্রাথমিক অবৈতনিক স্কুলে পাঠাচ্ছেন। মুখ্যু হওয়ার কষ্টটা খানিকটা বোঝেন বলেই হয়ত।

তখনও বিয়ে হয়নি ওঁর। যতদিন যাচ্ছে, সংসারের অভাব-অভিযোগ আরো বাড়ছে। বাড়ির এই আর্থিক সংকট খানিকটা লাঘব করতেই কলকাতার চাঁদনিতে এক গুজরাটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নিলেন মুন্নী। তখন বয়স ষোলো কি সতেরো। মাসমাইনে ঠিক হল পঞ্চাশ টাকা। শ্যামনগর থেকে প্রতিদিন ভোরবেলা কলকাতার পথে পাড়ি দেওয়া আর সন্ধ্যার লোকালে গাড়ুলিয়া ফিরে যাওয়া। খুব অল্প দিনেই কাজের বাড়ির অনাত্মীয় মানুষগুলো কেমন যেন 'আপনার' হয়ে উঠতে শুরু করল তাঁর কাছে। সততা আর নিষ্ঠা দিয়ে মুন্নী জয় করে নিলেন গুজরাটি পরিবারটির মন। তবে রেলের বগিকেই যে দিন গুজরানের তাগিদে একদিন আরো 'আপনার' করে নিতে

হবে, এ'কথা একবারও মনে আসেনি তখন। চড়াই -উৎরাইহীন ভাবে দিনগুলো কাটছিল। ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে গুয়াহাটি থেকে পালিয়ে আসা ছেলেটির সঙ্গে। শিয়ালদার একটি চায়ের স্টলে কাজ করে সে। ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতা। তারপর একদিন বাড়ির অমতেই বিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হল না, কারণ তাঁরা অবস্থাপন্ন। বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে গড়িফায় চলে এলেন তাঁরা। ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করলেন। ততদিনে মুন্নীর স্বামী চায়ের স্টলে কাজ ছেড়ে ট্রেনে, ট্রেনে ইমিটেশনের জিনিস নিয়ে হকারি শুরু করেছেন। চাইছেন মুন্নীও লোকের বাড়ির কাজ ছেড়ে তার সঙ্গে ফেরির কাজে আসুক। একবছরে মাসমাইনে বেশ খানিকটা বেড়েছে। তবু সংসারের নুন আনতে পানতা ফুরোয়। তাই স্বামীর কথামতো বিয়ের পরের বছরই পরিচারিকার কাজ ছেড়ে রেলের পথে পাড়ি দেওয়া। গৃহকর্মে দক্ষ মুন্নী বিবি তার স্থানিক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন প্রথম এই ভ্রাম্যমান কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করেছিলেন, এগারো বছর আগের সেই স্মৃতিটার উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও তার মনে। কেমন ছিল তার সেই প্রথম দিন ট্রেনে হকারি করার অভিজ্ঞতা? বিনম্র হেসে মুন্নী বলেন — ''বহুত শরম লাগাথা''। হাঁকাহাঁকি করে বেচার শিল্পটা একদমই রপ্ত ছিল না তখন। তার উপর আর বাংলা বলতে ও বুঝতে না পারার অক্ষমতা। খরিদ্দাররা ভাল-মন্দ কিছু বললেও উত্তর দিতে পারতেন না সেই সময়। সচল ট্রেনে এমন অচল, আড়ষ্ট, লাজুক হলে তো ফেরিকাজের প্রাথমিক শিক্ষার্থীই হওয়া যায় না। ঈষৎ ঠাট্টা-তামাশাও কোনো কোনো হকার বন্ধু করতেন মুন্নীকে। বাজারটা যে প্রতিযোগিতার দৌড়বাজিতে টেটম্বুর। স্রোতের অনুকূলে সাঁতার না কেটে পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে হালে পানি মিলবে না। সেদিনের অনভিজ্ঞ মুন্নীবিবি না বুঝলেও, খরিদ্দার দিদিরা ঠিকই বুঝতেন। তাঁরা নিজেরাই মুন্নীকে ডেকে বোঝাতেন, ''তুমি নিজে থেকে না হাঁকলে কেউ কিনবে না।'' কথায় বলে, ''খোদাই খদ্দের''। লাজুক, স্বল্পভাষী এই মেয়েটাকে ওঁরা নিজেরাই বলতেন, ''এসো, তোমার মাল কিনব''। মুখের আড়ষ্টতা আর মনের জড়তা ভাঙাতে ট্রেনের দিদিরা তখন যেন 'ফেরেস্তা'র মত কাজ করেছেন। তাই খরিদ্দারদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা উঠলে মুন্নীবিবি কখনও ওদের খরিদ্দার বলে মানেন না। বলেন, ''ওরা আমার ট্রেনের দিদি''। বারো বছরের হকারি জীবনে এই সম্পর্কে কোন রদবদল ঘটেনি। তবে রদবদল ঘটেছে বিক্রি বাট্টায়। আগে দিনে ৪০০-৫০০ টাকার বিক্রি হতো। ইদানিং দৈনিক ১০০-১৫০-এ এসে ঠেকেছে। মুন্নীর স্বামী সবসময় ওকে বলতেন, ''ব্যবসার ওঠা-পড়া তো আছেই। তবে এই কাজ ধরে থাকলে কারুর কাছে হাত পাততে হবে না। কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হবে না। তাই তুমিও আমার সঙ্গে কাজ শেখো''। বারো বছর আগের সেই কথাটা আজও মুন্নীর কানে বাজে। এই বারোটা বছর জীবন তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। ফেরির কাজটা আজ পাকাপাকিভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। বাংলাটাও বেশ বলতে পারেন। দেখেই বুঝি, এখন তিনি একজন ''পাক্কা রেল হকার''।

নিজের কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই ওঁর। ব্যাঙ্কে খাতা করা কিংবা দশ-বিশ টাকা সঞ্চয়পাতিও কিছু সম্ভব হয় না। কারণ যা আয় করেন, দিনেরটা দিনে খরচে লেগে যায়। আর কিছুটা পয়সা সরিয়ে রাখেন ব্যবসার প্রাত্যহিক পুঁজির জন্য। তবে স্বামীর কথামত সত্যিই তাকে কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হয় না আজ। কষ্টের পয়সা, তবে জীবনটা চলে যায়। বাহুল্য নেই ঠিকই, তবে সম্মান আছে। মানুষটার যেমন মনের জোর, তেমনই সম্মানবোধ। শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়ি কোন তরফেই কোনো যোগাযোগ রাখেন না মুন্নী।

বছর তিনেক আগে এই ইছাপুর স্টেশনেই চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছেন মুন্নীর স্বামী। ততদিনে পেটের দায় সামাল দেওয়ার মতো কাজ শিখে গেছে মুন্নী। কিন্তু সে তো ওই লোকটারই দেখানো এই রেলের পথে! শূন্যতা যাবে কোথায়? স্বামী-স্ত্রীর হকারিতে সামান্য যা জমিয়েছিলেন, আকস্মিক এই বিপর্যয়ে তার সবটুকু খরচ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ করে দিলেন মুন্নী। কিন্তু পেট যে বড় বালাই। ঘরে ছোট ছোট দুটো মেয়ে। দুঃখ, শোক চেপে রেখে তাই আবার একদিন বেরিয়ে পড়লেন ইছাপুরের মুন্নীবিবি। স্থানীয় হকার্স ইউনিয়নের কাছ থেকে কোনপ্রকার আর্থিক সাহায্য নেননি স্বামীর মৃত্যুর কারণে। সাহায্য নেননি শ্বশুর বাড়ি বা বাপের বাড়ি। জীবনের শিক্ষায় কোনো খাদ নেই নিরক্ষর মুন্নীবিবির। এত প্রতিকূলতার ভিতরেই হাসিমুখে ''খাটছি, কামাচ্ছি সবই 'ওপরওয়ালার' ইচ্ছা। তাই প্রতিদিনেরটা প্রতিদিনই জুটে যায়। ও নিয়ে কখনও চিন্তা করি না।'' কোরাণ, কেতাব, হাদিস না পড়া মুন্নীবিবি তাঁর এই প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াই- এর যাবতীয় কৃতিত্ব দেন তাঁর 'ওপরওয়ালে' কে। তাঁর মতে, ওপরওয়ালা বলেন— ''তোমরা মেহনত কর, আমি মজুরি দেব।'' মুন্নীবিবি বলেন— ''আমি মেহনত করি। তাই ওপরওয়ালা আমাকে মজুরি দেন। আমি বাচ্চাদের খাওয়াই না, ওপরওয়ালা খাওয়ান।'' মুন্নীবিবির জীবনদর্শনের আয়ত্তে পেলে অনেক বিদ্বজ্জন কি ভাঙতে পারতেন জ্ঞানের শৃঙ্খল?

দৈনিক কাজ সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা। এরমধ্যে দুপুরে কোন এক সময়ে ইছাপুর স্টেশনে নেমে অল্প কিছু মুখে দিয়ে নেওয়া আর তারপর সকাল থেকে দুপুর অবধি যা বিক্রি হয়েছে, সেই টাকা লাগিয়ে ছিপুরের মহাজনের কাছ থেকে মাল তুলে বিকালের গাড়িতে চাপা। রাত্রি সাতটা-আটটা অবধি যা বিক্রিবাট্টা হল, তা নিয়ে ঘরে ফেরা। এই হল মুন্নীবিবির প্রতিদিনের কাজের দস্তুর। জীবনের কাছে তাঁর বিশেষ কিছু চাওয়ার নেই। সপ্তাহান্তের অবসর বিনোদন বলতেও কিছু বোঝেন না। কারণ সোম থেকে রবি প্রতিটি দিনই কাজ তবে মেয়েদুটোর সখ, আহ্লাদ পূরণ করতে চান সবসময়েই। পুজো, ঈদের সময় যখন বিক্রিবাট্টা ভাল চলে, সেই পয়সা বাঁচিয়ে রাখেন।

পরবে মেয়েদুটোকে নতুন কাপড় দেওয়ার জন্য। ওরা একটু লেখাপড়া, একটু সেলাই-ফোরাই শিখে নিক। এরকমই তাঁর ইচ্ছে। তবে লক্ষ্ণৌ-এর রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারের মেয়ে মুন্নীবিবি আজ চান না, তাঁর মেয়েরা তাঁর মতো বাইরে বেরিয়ে কোনো কাজ বা চাকরি করুক। তিনি আজ নিজে স্বনির্ভর। কিন্তু বাইরের জগৎটার ওপর তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। ঘর আর বাইরে তাঁর কাছে সাদা আর কালো। তাই মেয়েরা যা কিছু করুক, যেন ঘরের ভিতরেই করে। নিজের জীবনের প্রতি তাঁর যেমন কোন অভিযোগ নেই, 'গম্' নেই, তেমনই দিনান্তের নুন-রুটিতেই তিনি খুশি। বেশি কামানোর অনেক দিশার কথাই মুন্নীবিবির কানে আসে। তবে নিজের আর সন্তানের ইজ্জত, আব্রু তাঁর কাছে অনেক বড়।

চলতি আইনকানুন আর রাজনীতি সম্পর্কে বিশে, অবগত নন মুন্নীবিবি। বারো বছর হকার পরিচয়পত্র ছাড়াই কাজ করে চলেছেন। তাঁর 'নামে'ই নাকি তাঁর জিনিসের পরিচয়। তবু সবার বলাবলিতে এইসবে ২০০৭-এ হকার্স ইইনিয়নের মাধ্যমে সচিত্র হকার পরিচয়পত্র করিয়েছেন। যদিও এই পরিচয়পত্রটির কোন আইনি বা সরকারি স্বীকৃতি নেই। ঈদ, বকরি ঈদ, মহরম কিংবা রেল রোকো আর বন্ধ সব মিলিয়ে বছরে পাঁচ-দশদিন ঘরে থাকেন সকাল থেকে রাত। বছরের এই কটা দিনই সন্তানদের একটু দেখভাল করতে পারেন। বাকি সময়টা প্রতিবেশীরাই ভরসা।

রেলগাড়ি আর তার সংলগ্ন অঞ্চলটির পরিবেশে একটা আলাদা রূপ, রস, গন্ধ লুকিয়ে থাকে। কখনও সেখানে কর্মব্যস্ত মানুষের হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ফেরিওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি, জোরতোর। কখনও আবার কারুর কোথাও যাবার তাড়া নেই এমনভাবে গা এলিয়ে বসে থাকার দৃশ্য। হাজারো বৈচিত্র্য নজরে আসে সেখানে। যে অনুসন্ধান প্রকল্পটিতে হাত দিয়েছি, সেই প্রকল্পের কাজেই মাঝে মধ্যে শিয়ালদহ-হাওড়া করতে হচ্ছে। সফুরা মণ্ডলের সঙ্গে আলাপটা এই রেলের পথেই হয়েছিল। সেদিন যেতে যেতে দেখেছিলাম, ইছাপুর রেললাইনের একধারে প্রায় জনমানবহীন একটা জায়গায় বছর চল্লিশের এক মহিলা গুটিকয়েক ডাব নিয়ে ঠা ঠা রোদের মধ্যে বসে আছেন। মাথার উপর একটা আচ্ছাদনও নেই। দু'নং প্ল্যাটফর্মটি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার ঠিক ধার-বরাবর লাইন সংলগ্ন জমির একপ্রান্তে রোজ তার পসরা সাজিয়ে বসে পড়েন সপুরা। রেলব্রিজটি ব্যবহার না করে যাঁরা সরাসরি রেল লাইন পেরিয়েই প্ল্যাটফর্ম বদল করেন, তাঁদের চলাফেরার পথেই ওঁকে নজরে পড়ে। প্রতিদিন ভোর দিনটের সময় সিমুরালির বাড়ি থেকে রওনা দেন আর দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই এখানে এসে হাজির হন। তারপর গোটা পনেরো - বিশটা ডাব নিয়ে সেই ভোর থেকে বিকাল অবধি বসে থাকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই একই দিনলিপি। এর অন্যথা হয় না সফুরার জীবনে। বছর পাঁচেক হল এই কাজে এসেছেন। স্বামী যতদিন ছিলেন, ঘর-গেরস্থালিই সামলাতেন। বাইরে বেরোতে হবে, সে কথা কখনও ভাবেননি। দিনমজুরি করে যা আয় হত, তাতে কোনক্রমে দু'বেলা নুন-ভাত জুটে যেত। তাই ঘরের বউ বাইরে গিয়ে কোন কাজ করুক, চাইতেন না সফুরার স্বামী। বছর দশেক আগে স্বামী মারা গেলেন। শ্বশুরবাড়িতে তখন আর জায়গা হল না সফুরার। স্বামীর ভাগের সম্পত্তিরও কিছু দিল না ওরা। নিরাশ্রয় সফুরা মেয়েটাকে নিয়ে উঠলেন ভাইদের বাড়িতে। সেই থেকে রয়েছেন ওদের কাছেই। লেখাপড়া, হাতের কাজ বিশেষ কিছুই জানেন না। কিন্তু কাজ তো একটা কিছু জোটাতে হবে। এ'ভবে দিনের পর দিন ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকাটা ভাল লাগে না তাঁর। মেয়েটারও বয়স বাড়ছে। বিয়ে -থার খরচ যোগাতে হবে। ভাইদের আশ্রয়ে মা-মেয়ের খাওয়া, পরার একটা সংস্থান হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এ'ভাবে তো সারাজীবন চলতে পারে না। তাই প্রতিদিনই মনে হয়, নিজের একটা কিছু করা দরকার। স্বামী বেঁচে থাকতে সংসারের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। বিপদ, আপদ, মেয়ের বিয়ে এ'সব কিছু ভেবে। ঐ টাকায় এতদিন হাত দেননি। ভাইয়েরাও জানে না সে কথা।

হঠাৎই কেদিন সফুরার মনে হল, ঐ জমানো টাকাটা দিয়েই কিছু একটা ব্যবসা শুরু করলে কেমন হয়। আদ্যোপান্ত কৃষক পরিবারের মেয়ে তিনি। বাবা ক্ষেতমজুরের কাজ করতেন। ধানের ব্যাবসাটাই তাঁর সবার প্রথমে মথায় এল। ঐ জামানো টাকাটা দিয়ে ধান কিনে ব্যবসা শুরু করলেন। ছোট্ট থেকেই ধান, চাল, গোলা, ঢেঁকির সঙ্গে সহাবস্থান। ধান কেনা, শুকোনো, ঝাড়াই করা এসব কাজের ঝামেলা তাই এতদিনে সুনিপুণভাবে সামলে উঠেছেন। কিন্তু এত ঝক্কিঝামেলা সামলেও ব্যবসায় লাভ তেমন কিছু হচ্ছিল না। একে স্বল্প পুঁজি, তার উপর এতরসব ঝক্কি। মাস গেলে ছয়শো - সাতশো টাকার বেশি রোজগার হচ্ছিল না। ভগ্নিপতি তাই পরামর্শ দিলেন, ''ডাবের ব্যবসা কর। শুকনো জিনিস, বেচাকেনার ঝঞ্ঝাট অনেক কম।'' চল্লিশ পেরিয়েছেন। অল্প বয়সের সেই জোরটা আর নেই যে মাল নিয়ে ট্রেনে উঠবেন। ট্রেনে ফেরি করতে হলে মালের বোজা ওঠানো-নামানোর জন্য যে কসরৎ তাঁকে করতে হবে, তা উনি পারবেন না। তাই স্থির করলেন, স্টেশনেই বসে বেচবেন। স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে স্টেশন চত্বরে বসার একটা সুবিধা এই যে এখানে নিত্যদিন প্রচুর মানুষের আনাগোনা। তাই খরিদ্দারের অভাব হয় না। একশ জনের দশজনও যদি কেনেন, তাতেই দিনে ৫০-৬০ টাকা হয়ে যায়। তবে সেই দশজনের জন্য সারাটা দিনই অপেক্ষা করতে হয়। কোনদিন বা সেটুকু খদ্দেরও জোটে না। তবে যেহেতু বারো মাস একই জিনিস বিক্রি করেন, তাই এ'কবছরে স্টেশনের মানুষজনের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে গেছেন তিনি।

গরমের সময় ব্যবসা করাটা বেশি কষ্টকর। তবে এই সময়টাতেই বিক্রিবাট্টা ভাল জমে। মাথার উপর একটা

ছাউনি বেঁধে মাচা তুলে যদি কাজটা করতে পারতেন, তবে তাঁর পক্ষে একটু সুবিধা হত। কিন্তু রেলের জনি। অস্থায়ী দখলদারি মুক্ত করতে মাঝে মাঝেই চলে আসে রেল পুলিশ। এইভাবে লাইনের ধারে বসাটাতেও স্থানীয় কিছু মাতব্বর জনের আপত্তি ছিল। অবশ্য union-এর ছেলেরা এসে তখন বাঁচিয়েছিলেন সফুরা মণ্ডলকে। ওরা বলল — ''পেটের দায়ে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করছে। করতে দিন।' মাঠে-ময়দানে, বনে-বাদাড়ে না বসে লাইনের ধারে খালি জমিতে বসে দু'পাঁচটা ডাব বিক্রি করলে কার যে বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, সফুরার মাথায় তা ঢোকে না। Union-এর কাছে নিজের নামে একটা কার্ড করার কথাও বলে রেখেছেন। কিন্তু দেব দেব করেও এখনও কিছুই করে দেয়নি ওরা। তাই একটু ক্ষোভ সফুরার। এ'কবছরে ব্যবসা করে যেটুকু জমিয়েছিলেন, সবই মেয়ের বিয়েতে খরচা হয়ে গেছে। উপরি দেনাপত্রও বেড়েছে খানিকটা। সেগুলো না মেটা পর্যন্ত ব্যবসার পুঁজিও বাড়ানো যাচ্ছে না। ভাইদের সংসারে প্রতিদিন ১০-২০ টাকা দিতে হয়। তবে যেদিন বিক্রিবাট্টা মন্দ থাকে, সেদিন আর কিছুই দিতে পারেন না। জামাই চাষের কাজ করে। ওদের তাই মোটা ভাত-কাপড় জুটেই যায়। রোদ, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এমন অস্থায়ী, অনিশ্চিত কাজ করতে আর ভাল লাগে না সফুরার। সখ হয়, কলে-কারখানায় যদি কোন কাজ পাওয়া যায়। মেয়ের বিয়েটা দিতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেও নিজের জীবনটা তো চালাতে হবে। সেই দুর্ভাবনা কুরে কুরে খায়। যখন অসুখ-বিসুখ বাধে কিংবা শোনেন বন্ধ, হরতালের কথা, দিনের রোজগারটা মারা পড়ে। সোম থেকে রবি কোন একটা দিনও ছুটি করেন না সফুরা মণ্ডল। সপ্তাহের শেষে তাই কোথাও ঘোরা-ফেরাও হয় না। মাঝে খবর পেয়েছিলেন, স্বামীর ভাগের সম্পত্তিটা দেওর, ননদরা মিলে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। দু'একজন পরামর্শ দিয়েছিল, 'মামলা ঠোকো।' আইন-আদালত করার সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই অন্যায়টা সয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি ওখানে কোন তল পাবো না।' সফুরার তীব্র অভিযোগ, 'কই সরকার, পুলিশ তো এখানে কিছু করল না।' অথচ পেটের দায়ে আমরা যখন করে, কম্মে খেতে চাই, তখন এরাই বেআইন বলে আমাদের উঠিয়ে দেয়।'

শিয়ালদহ দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় আজ আলাপ হল রেখা মন্ডল আর তাঁর দিদি মনা হালদারের সঙ্গে। প্রায় ছ-সাত বছর হতে চলল, দু'জনেই ক্যানিং-বাবুইপুর লাইনে মনোহরি জিনিস ফেরি করেন। রেখা মণ্ডলের স্বামী রিক্সা চালাতেন। ডাল-ভাতের যোগাড় কোনো মতে হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন রেখার স্বামী। লোকের বাড়িতে দু'বেলা পরিচারিকার কাজ নিলেন উনি। দুই মেয়ে তখন খুব ছোট। বড়মেয়েটি জন্মের পর থেকেই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। কিছুদিন যেতে না যেতে কাজের বাড়িতে খারাপ ব্যবহার শুরু করল। বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হল সেই কাজ। একদিকে সংসারের খরচ আর অন্যদিকে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা — সব মিলিয়ে চরম সংকট। দূর সম্পর্কের এক ভাই হকারি করত। প্রথম সেই বুদ্ধিটা দিল। রেখা মণ্ডলের জবানবন্দিতেই তার বাকি কথাটা তুলে দিলাম।

প্রথম দিন কাজ করতে নেমে খুব ভয় লেগেছিল। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। ভাবছিলাম, কেউ কিনবে কি না? সেদিন মাত্র চার টাকার বিক্রি হয়েছিল। সেপটিপিন, টিপের পাতা। সিঁদুর, ফিতে, ক্লিপ এসব বিক্রি করে এখন দিনে ত্রিশ-পঞ্চাশ টাকা হয়। অন্য কাজ করার কথা ভাবি। কিন্তু হাতের কাজ তেমন জানি না। বড় মেয়েটার চিকিৎসা বাবদ অনেক ধারদেনা হয়ে যায়। তাই ব্যবসার পুঁজি বাড়াতে পারি না। হাজার টাকা পুঁজি হলে খুব ভাল হয়। তবে খুব বেশি পুঁজি লাগিয়ে বিক্রি না হলে টাকাটা আটকে যায়। যতদিন যাচ্ছে, এই লাইনে হকারের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু আমরা কাউকে বাধা দিই না। কারণ সে-ও তো অভাবি। তবে সমঝোতা করে গাড়ির সময়টা বদলে নিই। এই যেমন আমি আর আমার দিদি দু'জন সবসময় আলাদা ট্রেনে চড়ি। সকাল দশটা থেকে রাত্রি দশটা অবধি কাজ করি। রেলের টিকিটবাবুরা মাঝে মধ্যে ধরপাকড় করে। আমাকেও একবার ধরেছিল। তখন একজন প্যাসেঞ্জারই এসে বাঁচায়। এই সাত বছরে ভাল-মন্দ সব ধরনেরই যাত্রীই নজরে এসেছে।

রেখার দিদি মনা হালদারও পাঁচ-ছ'বছর এই লাইনে কাজ করছেন। ওঁরও স্বামী মারা গেছেন তেরো বছর হতে চলল। Vendor -এ মাল বওয়ার কাজ করতেন তিনি। কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটি বাড়িতে কাজ করতেন মনাও। তখন মাসমাইনে ছিল সাড়ে তিনশ টাকা। তবে লোকের বাড়ির কাজের চেয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফেরি করা অনেক স্বাধীন কাজ। কাজে না এলে মাইনে কেটে নেওয়ার ভয় নেই। মালকিনের মন যুগিয়ে চলার তাগিদ নেই। নিজের ইচ্ছেমত কাজ কর, খাটো, খাও। এখানে নিজের মর্জির মালিক তুমি নিজেই। তাই বাড়ির কাজ ছেড়ে মনা পাকাপাকিভাবে চলে এলেন নিজের হকারি পেশায়। এ'কাজে ঝুঁকি আছে। দুর্ঘটনার ভয় আছে। তীব্র লড়াই আছে। তবু মনে হয়, অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করা যায়।

মনা বলেছিলেন এই ক'বছরে তাঁর হকারি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন বারুইপুর লোকালে প্রচণ্ড ভিড়। মাঝের একটা ট্রেন cancel হয়েছে। তাই দুই ট্রেনের প্যাসেঞ্জার এক ট্রেনে। সোনারপুর স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন এক মধ্যবয়স্কা বাঙালি বউ। মনা হালদারও ছিলেন ঐ ট্রেনটাতে। নিজের মাল ফেলে উনি বিপন্ন মানুষটাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। মনা হালদারের জন্যই সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও তিনি দেখাননি ওর প্রতি। বরং একটা সামলে নিয়েই চোটপাট করেছিলেন এই বলে যে, কেন ''গন্ধ কাপড়ে ও আমাকে ধরল?'' আসলে মরি, বাঁচি, খাই-না-খাই, শ্রেণি প্রভেদের ধারণাটা

আমরা খুব সচেতনভাবেই লালন-পালন করি। তাই রেখা মণ্ডল, মনা হালদারদের 'রেলের ফেরিওয়ালি' ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। ভাবতে চাই না।

শক্তিগড় স্টেশন পেরিয়ে গেছি। দুদ্দার গতিতে ট্রেনটা ছুটছে বর্ধমানের দিকে। ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁই ছুঁই। এই ট্রেনেই দেখা হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। সাজগোজ বলতে অবিন্যস্ত কালো পাড় সাদা ধুতিটা মাথায় একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া। বয়স ষাট পেরিয়েছে। কিন্তু রোগাপাতলা মানুষটা এখনও বেশ শক্তই আছেন। খুব দ্রুততার সঙ্গে কামরার একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যাচ্ছেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাতে আছে একটা বড় চটের ব্যাগ আর তাতে রয়েছে হাতের তৈরি কিছু ঘর সাজানোর জিনিস। পুঁতি দিয়ে করা তারের মুকুট, জাপানি পুতুল, কাগজ আর তারের তৈরি ফুলদানি। কোনোটার দাম ৩০টাকা, কোনটা - বা ৫০ টাকা। নিতে যে কেউ বিশেষ আগ্রহী হচ্ছেন, তা নয়। প্রায় চার দশক ধরে হাওড়া - বর্ধমান লাইনে ফেরি করছেন তিনি। পছন্দ - অপছন্দের বাজারটা তাই নিজের চোখে বদলাতে দেখেছেন। আগে এ'সব হাতের তৈরি জিনিসের যেমন একটা কদর ছিল, আজকাল মানুষ আর এ'সব জিনিসের তেমন কদর করে না। তাই এখন বিক্রিবাট্টা খুব মন্দ। স্বনির্ভর প্রকল্প গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের তৈরি এ'সব জিনিসগুলি ওদের কাছে থেকে ধারে নিয়ে আসেন। প্রতিদিনই তিনশ-চারশ টাকার মাল সঙ্গে রাখতে হয়। সারাদিনের বিক্রিবাট্টার শেষে নিজের লাভের টাকাটুকু রেখে ওদের মালের দাম ফেরৎ করেন। একটা সময় ছিল যখন চেনা - পরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে ধার বাকি রেখেও কারবার করতেন। কিন্তু একবার তিন হাজার টাকা চোট যয়। তারপর থেকে নগদ ছাড়া কিছু বেচেন না। তবে তিনি বোঝেন, যতদিন যাচ্ছে, এ'সব জিনিসে মানুষের ঝোঁক কমছে। এখন অবশ্য নতুন কোনো মাল নিয়ে নামাও মুশকিল। নতুন মাল বেচতে গেলে সে সম্পর্কে আগে থাকতে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। না হলে লোকসান হবে। আর তাছাড়া বয়সও হয়েছে। একটানা বেশিক্ষণ কাজ করতে পারেন না আজকাল। দিনে একশ টাকার বিক্রি হলে তবে মাস শেষে হাতে কিছু থাকে। ফল কিংবা সবজিপাতির কারবার করলে আয় - রোজগার ভালই হয়। কিন্তু ভার বোঝা টানার সমস্যা। তাই এ'সব হালকা পলকা জিনিসের ফেরি করা ছাড়া অন্য উপায় নেই তাঁর।

এইভাবেই চল্লিশটা বছর কেটে গেল আরতিরাণী দে'র। ওদের আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। দেশ যখন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান হল, তখনই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। বাবা অন্যের জমিতে মজুর খাটতেন। আরতিরাণীই একমাত্র সন্তান। আর পাঁচটা দরিদ্র পরিবারে শৈশবটা যেমন কাটে। প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। অপত্য বোঝাটা স্থানান্তরিত করে খানিকটা দায়মুক্ত হলেন তাঁর বাবা, মা।

প্রথম কিছু বছর বেশ সচ্ছলতার মধ্য দিয়েই কাটছিল। জায়গা-জমির দালালি করে স্বামীর তখন ভালই আয়। কিন্তু বিধি বাম। কয়েকটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আরতিরাণীর স্বামী মানসিক ব্যাধির শিকার হলেন। লোকে বলল, 'কেউ ঈর্ষায় বাণ মেরেছে।' সে যাই হোক, পুরো সংসারের হালটা তখন থেকে আরতিরাণীকেই ধরতে হল। বাড়িতে চালমুড়ি ভেজে বাজারে, বাজারে বিক্রি করা শুরু করলেন। এ'কাজে পরিশ্রম প্রচুর। রোজ ভোর চারটের সময় ওঠা, চাল-ঝাড়াই-বাছাই, ভাজা। তারপর বস্তায় ভরে নিয়ে বেলার হাটে গিয়ে বসা। এক হকার ছেলেই বুদ্ধিটা জুগিয়েছিল। তারপর তো দেখতে দেখতে কয়েকাট দশক পেরিয়ে গেল। হকারি করতে করতে এখন চুলে পাক ধরেছে। সরকারের তরফে সামান্য বৃদ্ধ ভাতাও মেলে না। তাই ভারি ক্ষোভ তাঁর। মা আর মেয়ে সংসারে দুটিমাত্র প্রাণী ওঁরা। মেয়ের বয়সও চল্লিশ পেরিয়েছে। সময় থাকতে বিয়ে-থা দিতে পারেন নি। মনে খুব আফশোস যে একটা ছেলে থাকলে আজ মাথার উপর দাঁড়াত। জীবনের কাছে কী পেয়েছেন, কতটুকু পেয়েছেন, গুছিয়ে বলতে পারেন না আরতিরাণী। একগাল হেসে খালি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধীর জমানীটা' খুব ভাল ছিল। না, রাজনীতি খুব যে কিছু বোঝেন, তখন খেয়েপরে একটু সুখ ছিল। এখন তো যা রোজগারপাতি হয়, বাড়ি ভাড়াই লাগে আড়াইশো টাকা। তা-ও আলো, পাখার লাইন নেই। মেশিনের তৈরি অনেক আধুনিক, সৌখিন জিনিস সস্তায় বাজারে বিক্রি হচ্ছে আজকাল। ওর জিনিসগুলো দেখে লোকে সোজা তাই বলে দেয়, 'এ'সব দিয়ে আর ঘর সাজানো যায় না।' বসার ঘরে cultureটা যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে আমাদের সৌন্দর্যবোধ। কিন্তু তারজন্য আরতিরাণীর মতো মানুষরা রাতারাতি পেশাটা তো বদলে নিতে পারেন না। তাই যুগধর্ম থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েন বাধ্য হয়েই।

দেশটা নাকি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। কাদেরকে নিয়ে এগোচ্ছে জানি না, তবে আরতিরাণীর মতো মানুষরা বোধহয় একই জায়গায় আটকে আছেন। প্রায় অশিক্ষিত এই মানুষটা এক নিমেষে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা অটলবিহারী বাজপেয়ির নামটা বলতে পারেন। কিন্তু জানেন না যে কোন রাজ্যে থাকেন। নামসর্বস্ব রাজনীতির প্রভাবটা এতটাই জোরালো যে রাজনীতির ভালটুকু-মন্দটুকু না বুঝলেও এই নামগুলো কেমনভাবে তাদের জানা হয়ে যায়।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের দোকান শ্রীমতী প্রধানের। একসময় স্বামী, শাশুড়ি মিলে চালাতেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর ঘর ছেড়ে তাঁকেই বাইরে বেরোতে হল। নেশাসক্ত, অকর্মণ্য স্বামীটিক যখন সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব থেকে মুখ ফেরালেন, তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই দোকানের কাজ হাতে নিলেন শ্রীমতি। সকালবেলাটা সংসারের কাজ সামলে দুপুরবেলা থেকে দোকান দেখা শুরু করতেন। একেবারেই অশিক্ষিত মানুষ তিনি। হাতের কাজকর্মও

বিশেষ কিছু জানা ছিল না। ছেলেমেয়েদুটোর মুখ চেয়ে ঘরের কাজের সঙ্গে বাইরের দায়িত্বটুকুও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেদিন। আজ অবশ্য অনেকটাই ধাতস্থ হয়ে গেছেন। রোজ দুটো, আড়াইটে নাগাদ চলে আসেন। রাত্রি দশটা, সাড়ে দশটা অবধি বিক্রিবাট্টা চলে তাঁর। মাস গেলে পনেরোশো-দু'হাজার হাতে আসে। ছেলেটা গাড়ি চালায়। সে-ও কিছু দেয়। বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেনি সে। ক্লাশ VII অবধি পড়ে ছেড়ে দিল। কথার ফাঁকেই ছ-সাত কাপ চা বিক্রি হয়ে গেলে শ্রীমতি প্রধানের। ডাউনের 'লক্ষ্মীটা' (লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল) ছেড়ে যেতেই ভিড়টা কিছুটা হালকা হল। আবার কথা শুরু করলাম আমরা। এই দোকানটা ওঁদের ৯২ সালের। দোকানটা ছিল বলেই করে কম্মে খাচ্ছেন আজ। যদিও জানেন, এটা কোন স্থায়ী প্রাপ্তি নয়। রেলের জায়গা। তাই যখন, তখন উচ্ছেদ করতে পারে। এই পঁয়ত্রিশ বছরের মাঝে মধ্যেই এমন সংকট উপস্থিত হয়েছে। তখন তাঁরা জোট বেঁধেছেন। সংগঠন করেছেন। পরিস্থিতি শান্ত হতেই আবার যে যার ঝাঁপ খুলেছেন। সারাটা দিনের বেশির ভাগ এই দোকান নিয়েই কেটে যায়। আলাদা করে জীবনের শখ, আহ্লাদ কিছু পূরণ হয়নি তাঁর। একমাত্র মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ভেবেছিলেন, এবার একটু শান্তি মিলবে। কিন্তু জামাইটি তাঁর স্বামীর মতোই কর্মহীন, মাদকাসক্ত। ফলে মেয়ে আর নাতনির ভরণপোষণের দায়িত্বও বর্তেছে তাঁর ঘাড়ে। নাতনিকে হোস্টেলে রেখে পড়াচ্ছেন। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন শ্রীমতি প্রধান। অন্ততঃ তার জীবনটা যেন এমন না হয়।

বিশেষ কিছু আর তাঁকে বলার বা তাঁর কাছ থেকে শোনার সুযোগ পেলাম না। ওঁর চায়ের স্টলের পাশে বসা এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ততক্ষণে আমাদের কথার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। লোকটি বলল — 'এই স্টলটা আমার। যা জিজ্ঞাসা করার, আপনি এবার আমাকে করুণ।' শ্রীমতি প্রধান তাহলে কে? ক্ষমতায়িত, স্বনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এক নারী? পিতৃতন্ত্রের প্রবল আস্ফালনটা চাক্ষুষ করলাম আর একবার। ক্ষমতায়ন, বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন এত পথে মুক্তি খোঁজার যে চেষ্টা চলেছে, সেই পথটা একটা জায়গায় এসে বোধহয় বন্ধ হয়ে যায় যেখান থেকে শ্রীমতি প্রধানরা বেরোবার কোন পথ খুঁজেই পান না। আরো কিছু কথা হয়তো উনি জানতে চেয়েছিলেন, প্রবল প্রতাপে এসে আগেই তা রুখে দিলেন স্বামীদেবতা! এতক্ষণে বুঝলাম, স্টলের পাশে গোবেচারা ভঙ্গিমায় বসে থাকা লোকটি আসলে কে?

মেয়েটা বরাবরই একটু খামখেয়ালি স্বভাবের। ক্লাস নাইন অবধি পড়ে আর পড়াশুনা করতে ভাল লাগল না। বেশ অভিজাত পরিবারের সন্তান। বাবা হেমচন্দ্র মুখার্জি পেশায় উকিল, দাদু বিভু সাঁপুইও যাদবপুর অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত নাম। তবে পরিবারের আভিজাত্য, কৌলিন্য, মান-মর্যাদার কোন আঁচই তাঁর জীবনে বিশেষ পড়েনি। শ্রীমতি প্রধানের সঙ্গে কথা বলে যখন ফিরছিলাম, ঐ বালিগঞ্জ স্টেশনেই ওঁর সঙ্গে আলাপ। নাম প্রমীলা মুখার্জি। বয়স পয়ঁত্রিশ পেরিয়েছে। বছর সাতেক হলো, ক্যানিং-সোনারপুর, শান্তিপুর-নৈহাটি লাইনে লেডিস ব্যাগ বিক্রি করছেন। আগে কাজ করতেন একটি ব্যাগের কোম্পানিতে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন অনেকদিন আগেই। কেন, কবে, কী কারণেই বা এমনটা ঘটল, তা তিনি বলতে চান না। তবে পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পেছনে যে তাঁর বোহেমিয়ান স্বভাবটা খানিকটা দায়ী, কথার আভাসেই তা বুঝলাম।

জীবনটা তাঁর যতটা সুন্দর হতে পারত, তা হয়নি। ব্যাগের কোম্পানির কাছ ছেড়ে প্রথম যেদিন ফেরির কাজে এলেন, তখন এক বাস্ক সেন্টের শিশি নিয়ে বারুইপুর লোকালে উঠেছিলেন। স্বামীও রেল হকার। তাঁরও ঐ একই জিনিসের কারবার। তবে তিনি বিক্রি করতেন স্থানীয় বাজারে ঘুরে, ঘুরে আর প্রমীলার কাজের জায়গা ছল রেলের মহিলা বগিটি। বেশ কিছু বছর হলো স্বামী ছেড়ে চেলে গেছেন। প্রমীলাও এখন সেন্ট ছেড়ে ব্যাগের হকারি ধরেছেন। এই কাজে তিনি খুশি। সারামাসে দশ-পনেরোদিন মাল ফেরি করেন আর বাকি দিনগুলোতে কাজকর্ম বিশেষ কিছু করেন না। কেন করেন না, সে কারণ দর্শাতে রাজি নন তিনি। তার সোজাসাপটা জবাব, 'সবসময় যে কাজ করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আমি বাইরে বেরিয়েছি নিজের মনটাকে Change করার জন্য'। মাসের ঐ বাকি দিনগুলোতে ঠিক কী করেন, তা গোপন করেন প্রমীলা মুখার্জি।

দুই ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। বড় ছেলেও মনোহারি জিনিস ফেরি করত। গত বছর একটা দুর্ঘটনা হয়। তারপর থেকে প্রায় অক্ষম। নিজে যেহেতু কিছুটা পড়াশুনা করেছেন, তাই ছেলেমেয়ের পড়াশুনার প্রতি ওঁর নজর ছিল। হকারি করেই ওদের হস্টেলে রেখে পড়িয়েছেন। ছোট ছেলেটি এবার মাধ্যমিক দিয়েছে আর মেয়েটি পড়েছে ক্লাস নাইন অবধি। বড় ছেলে বউ-ই সংসারটা সামলায়। ঘরের কাজকর্ম তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হয় না। সকাল দশটা-একারোটা নাগাদ কাজে বেরোন আর বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত্রি দশটা-এগারোটা হয়ে যায়? অবসর বিনোদন বলতে মাঝে মধ্যে ভাল সিনেমা এলে দেখেন।

পাঁশকুড়া স্টেশনের এক চপ বিক্রেতার কাছ থেকেই ওঁর খোঁজটা পেয়েছিলাম। নাম রাণুবালা সাহা। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। উনআশি সাল থেকে কাগজ ফেরি কাজটা শুরু করেছিলেন। বরিশালের পোদ্দার বংশের মেয়ে উনি। মা শর্মিষ্ঠা পোদ্দার আর বাবা যতীন্দ্রনাথ পোদ্দার। বিত্তশালী পরিবার। কোনকিছুরই অভাব ছিল না। ঢাকাবাজারে বাবা যতীন্দ্রনাথ পোদ্দারের বড় কারবার ছিল। দেশভাগের কয়েক বছর আগেই সপরিবারে এ'দেশে চলে এলেন ওঁরা। ইন্টালি পদ্মপুকুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। রাণুবালা ভর্তি হলেন ইন্টালি জগদীশ স্কুলে। আট ক্লাস পেরোতে না পেরোতেই বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করল। রাধামোহনপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ী সাহা

পরিবারেই শেষপর্যন্ত পাকা কথা দিলেন যতীন্দ্রনাথবাবু। প্রচুর দিয়ে থুয়ে কন্যা বিদায় তো হল, কিন্তু তাঁরা তখন্য বোঝেননি যে ব্যবসা বলতে অযোধ্যামাধব সাহাদের ছিল মোটে সুতোর থান কাপড়ের একটি দোকান। স্বামী অযোধ্যামাধবের নিজের কাজ-করবার বলতে তখন কিছুই ছিল না। এই প্রতারণার খেসারত দিতে হল রাণুবালাকে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মেয়েদেরকেই সবকিছু মানিয়ে ও মেনে নিতে শেখানো হয়। রাণুবালাও তাই শিখেছিলন। সোনাদানা যেটুকু এনেছিলেন, তাই বেচেবুচে কিছু বছর চলল। দুই ছেলে অসিত আর অমিত তখন খুব ছোট ছোট। স্বামীর কোন স্থায়ী রোজগার নেই তখনও। কখনও সখনও চাষের কাজ করেন। নিতান্ত নিরুপায় রাণুবালা সম্ভ্রম, ঐতিহ্য, বংশগরিমা ভুলে রাধামোহনপুরের হেড মাস্টারমশাই সুকুমার দাসের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নিলেন। মাসমাইনে তখন পঁচিশ টাকা। অর্ধেক দিনই বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, তবু বাইরে মানুষের কাছে বুঝতে দিতেন না সে কথা। মাস্টারমশাই-এর ছেলেমেয়েরা যখন জিজ্ঞাসা করত, ''কাকীমা, আজ কি রেঁধেছো''। রাণুবালা শুকনো হাসি হেসে বলতেন, ডাল, মাছের ঝোল আর ভাজা। ওঁরা সবই বুঝতেন। তাই মাঝে মাঝেই ২-৫ টাকা দিয়ে সাহায্যও করতেন তাঁকে। রাতের খাবার প্রায়দিনই বরাদ্দ থাকত আড়াইশো মুড়ি আর এক ঘটি জল। বিয়ের সময় পাওয়া এক, দু'খানা ভাল কাপড় তখনও অবশিষ্ট ছিল। ভাল কাপড়টা পরে কাজে বেরোতেন আর সঙ্গে নিতেন পুরোনো ছেঁড়া একখানা শাড়ি। কাজের বাড়িতে ছেঁড়া কাপড়টা পড়ে কাজ করতেন। ফেরার সময়ে আবার ভাল কাপড়টা পরে নিতেন। একখানা ভাল শাড়ি দিয়ে বংশমর্যাদা বনেদিয়ানা আর পরিবারের ঐতিহ্যটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন রাণুবালা। কিন্তু এ'ভাবে আর কতদিন? রাধামোহনপুরের স্কুলমাস্টার পুলকবাবু আর হেডমাস্টার সুকুমারবাবুই তাঁকে বুদ্ধিটা দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দিলেন নগদ দেড়শটি টাকা।

দশখানা আনন্দবাজার, দু'খানা বসুমতী, তিনখানা যুগান্তর আর দু'খানা সত্যযুগ এই ছিল রাণুবালা সাহার প্রথম দিনের রসদ। হাওড়া দক্ষিণ - পূর্ব শাখায় তখন আর কোন মেয়েই ফেরির কাজে আসেনি। একেবারে অনভিজ্ঞ, অনভ্যস্ত রাণুবালার মনে তখন একরাশ দ্বিধা, লজ্জা, শঙ্কা। চোখে তাঁর জল আর হাতে ১৫-২০টা খবরের কাগজ। কী ভাবে যাবেন লোকের কাছে? কী বললেন? একা একজন মেয়ে কাগজ ফেরি করে বেড়াচ্ছে — স্টেশনে লোকে কী চোখেই বা তাকে দেখবে, এ'সব ভেবে তিনি তখন দিশাহারা। অমূল্য ব্যাপারী নামে এক চাল ব্যবসায়ী তখন ভরসা দিতে এগিয়ে আসেন। সেই মানুষটার কথাগুলো আজও রাণুবালর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে অছে। অমূল্য ব্যাপারী বলেছিলেন, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন?' এরপর প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, আজও তিনি কি স্টেশনে, কি রেলে সেই মা, মাসী, বৌদির সম্মানটুকুই পেয়ে আসছেন। চেনা পরিচিত মানুষজন কিংবা মাস্টারমশাইরা নিজেরাই এগিয়ে এসে ওঁকে সাহায্য করেছেন অনেকবার। ওঁরা নিজেরাই বলতেন, ''দাও বৌদি, আমিই দিয়ে আসছি কাগজটা। তোমাকে প্ল্যাটফর্ম বদল করতে হবে না।'' ভোর তিনটের সময় বড়ছেলে অসিতকে নিয়ে রাণুবালা চলে আসতেন হাওড়ায়। পাইকারদের কাছ থেকে মাল নিয়ে ফিরে যেতেন। এখন তিনি নিজেই পাইকারি বিক্রেতা। প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কাগজের যোগান দেন খুচরো বিক্রেতাদের। খুচরো বিক্রির কাজটা অবশ্য নিজেরাও চালিয়ে যাচ্ছেন। মাধুপুর স্টেশনে রাণুবালা নিজেও নিয়মিত বসেন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ন'টা অবধি। খুচরো বিক্রির কাজে ছেলেরাও যুক্ত আছেন। সেই সঙ্গে পাইকারি ব্যবসার দিকটাও দেখেন ওঁরা। মায়ের নামেই সবকিছুর রসিদ হয়। Agency নিতে গেলে প্রতিমাসের শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোম্পানির ঘরে জমা রাখতে হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে Bank Draft - এর মাধ্যমে এই টাকাটা কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিতে হয়। যে যে স্টেশনে agency নেয়া আছে, সেই স্টেশনগুলোতে প্রতিদিন ভোরবেলা খবরের কাগজের দপ্তর থেকে মাল চলে আসে। পাইকারি agent রা তখন খুচরো বিক্রেতাদের যোগান দেন। সবটাই চলে ধারে। সারাদিনের বিক্রি শেষে খুচরোর বিক্রেতারা তাদের বাঁধা পাইকারদের টাকা পরিশোধ করেন আর পাইকাররা কোম্পানিকে। মাধপুর, ভোগপুর, রাধামোহন, পাঁশকুড়া, মেচেদা এই স্টেশনগুলিতেই রাণুবালার অধীনে চার-পাঁচজন করে খুচরো বিক্রেতা কাজ করেন। এইভাবেই আজ জনা ত্রিশ মানুষের জীবিকার সংস্থান করেছেন তিনি। বড় ছেলে অসিত পাইকারি ব্যবসার Company dealings গুলো করেন আর ছোট ছেলে দেখেন আদায়ের দিকটা। মাধপুর স্টেশনে বর্তমান কাগজের agency টি পুরোটাই ওঁদের। মাসে এখন সবকিছু দিয়ে তুয়ে তাঁর হাতে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা থাকে। মাত্র পনেরোটা কাগজ দিয়ে শুরু করে আজ এতগুলো কাগজের 'পাইকারি এজেন্ট'। উত্তরণের এই চমকপ্রদ গল্পের এখানেই শেষ নয়। রাণুবালা সাহা একজন প্রকৃত উদ্যোক্তা মানুষ তাই কাগজ ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব উদ্যোগে একটা ছোট্ট হোটেলেও খুলে ফেলেছেন মাধপুর স্টেশনের রেল গেটটার ধারে। হোটেল কারও প্রায় বারো-তেরো বছর হতে চলল। হোটেলের নামটা রাখতে চেয়েছিলেন, ''বৌদির হোটেল।'' কিন্তু পরিচিত জনেরা জোর করে পেছনে 'আদর্শ' শব্দটা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই নাম হয়ে গেছে ''আদর্শ বৌদির হোটেল।''

সত্যিই একজন আদর্শ মানুষ রাণুবালা সাহা। সম্পূর্ণ নিজস্ব কর্মদক্ষতায় আর ব্যবস্থাপনার গুণে তিনি তাঁর ব্যবসার পরিসর ক্রমেই বাড়িয়েছেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা আর উদ্যমটুকু চিনে নিতে এতটুকু অসুবিদা হয়নি স্টেশনমাস্টার কিম্বা রেলের বড়বাবুর। তাই বৈরাগীবাবুদের সহযোগিতা আর অনুপ্রেণায় উদ্যোগটা নিতে পেরেছিলেন। রেলেরই আধ ছটাক জমিতে মাটির তিন কামরার ঘর বানিয়ে, কাগজ ব্যবসার জমানো টাকা দিয়েই এই হোটেলটা খুলে

ফেলেছিলেন সেদিন। আজ তাঁর এই হোটেলে তিনজন কর্মচারী। বড় কর্মচারী সন্ধ্যা কোটাল যাঁর কাঁধেই থাকে সিংহভাগ দায়িত্ব। এছাড়া আছেন অর্চনা দাস, মঞ্জু দাস। ওঁদের মাসমাইনে হাজার টাকা। মাস গেলে এই ব্যবসা থেকেও তাঁর চার - পাঁচ হাজার আয় হয়। রাণুবালা সাহা নিজে একজন স্বনির্ভরশীল মানুষ। সেই সঙ্গে আরো পাঁচটা মানুষের তিনি স্বনির্ভরশীল হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন। বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে ছিলেন তিনি। ব্যবসার বোধটা হয়তো রক্তেই ছিল। কাগজ ফেরি আর হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি ইদানিং তেঁতুলের কারবারও ধরেছেন। এটা ওঁর কাছে ''সিজন কারবার।'' অর্থাৎ তেঁতুলের সময় ১০-১৫ কুইন্টাল তেঁতুল তুলে রাখেন আর অন্ধ্রপ্রদেশে যোগান দেন। সারাদিনই কাজের মধ্যে রাখেন নিজেকে। সকাল ন'টা অবধি মাধপুর স্টেশনে বিক্রিবাট্টার কাজ সেরে চলে আসেন তাঁর হোটেলে। দুপুর থেকে বিকাল অবধি এখানকার ব্যবসা চালিয়ে বিকাল পাঁচটার গাড়িতে বাড়ি ফিরে যান। বেশ কিছুদিন হল, বিয়ে - শাদির নতুন কাপড়ের order supplier-এর কাজও ধরেছেন তিনি।

পাঁশকুরা স্টেশনে পুরনো মানুষজনেরা একডাকে চেনেন রাণুবালা সাহাকে। ছোট, বড় সকলেরই একটা সহজাত শ্রদ্ধাভাব আছে তাঁর প্রতি। এই যে রেলের জমিতে দোকান করেছেন, কেউ এসে বাধা দেয়নি কিংবা এক পয়সাও ঘুষ নেয়নি। বেআইনি দখলদারিতে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিটা চলে। বেআইনি দখলদার হাটাতে উচ্ছেদ অভিযান হয়ত একদিন হবেই। সেক্ষেত্রে রেলের কর্তাব্যক্তিরা আশ্বাস দিয়েছেন যে তখন রাণুবালাকে হোটেলের জমিটা lease দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ব্যাঙ্ক, রেল, পোস্টঅফিস -এর লোকজন, ছোট-বড় ব্যবসাদার অনেকেই নিয়মিত খান তাঁর হোটেলে। তেরো টাকার সবজি ভাত, সতেরো টাকার মাছ-ভাত আর পঁয়তাল্লিশ টাকার যেখানে মাংস-ভাত মেলে, সেই 'আদর্শ বৌদির হোটেল' তাই এত সহজে ভাঙ্গা পড়বে বলে মনে হয় না। তবে ভাঙা পড়লেও আজ আর চিন্তা নেই রাণুবালার। কিছু জমিজমা, মাধপুর স্টেশনের ধারে পাকা বাড়ি, পোস্টঅফিস আর ব্যাঙ্কে কিছু সঞ্চয় সব মিলিয়ে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে পুরোপুরি সফল তিনি। তাঁর কথায় ''এখন নিজের সখ পুরণ করি আর অন্যের সখও পূরণ করাই।'' বউমারা সকলেই শিক্ষিতা, নাতিনাতনিরাও পড়াশুনা করছে। বড় নাতি MBA পড়ছে আর ছোট নাতি কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 1st year। পরিবারের গল্প উঠতেই তৃপ্ত বাণুবালা সাহা যেন ''সব পেয়েছি'র দেশে চলে যান। পরিবারে আর কোন কষ্ট নেই। জামাইরা সব প্রতিষ্ঠিত। বড় জামাই দুলাল দত্ত এখন ধনশালী মানুষ। বর্তমানে খবরের কাগজের District Agency আছে। আর ছোটজন গোপীনাথ সাহা চাকরি করেন Birla Industrial Group -এ। রানুবালার ভাইরাও সব অবস্থাপন্ন। কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে রিম কাগজের ব্যবসা। টিটাগর পেপার মিলের agency -ও নিয়েছেন তাঁরা। এক ভাই দীর্ঘদিন কাজ করেছেন যাদবপুরের ওষুধ কোম্পানির Assistant Manager পদে। বংশগৌরব আর কৌলিন্যের কথা বারবারই ফিরে আসছিল তাঁর স্মৃতিতে। তবে তাঁর সংগ্রামের দিনগুলো আজও তিনি সযত্নে লালন করেন মনে। সংগ্রামের সেই অতীত হাতড়েই বলছিলেন — ''সেই সময় শেওড়াফুলিতে বাসন্তীদির মা-ও খবরের কাগজ ফেরি করতেন। হাওড়া লাইনে তখন আমরা ছাড়া আর কোনো মেয়ে ছিল না। এখন অবশ্য আল্পনা করে। এইতো কিছু বছর আগে এই ফেরি করা নিয়েই আমার ছেলের সঙ্গে আল্পনার ঝামেলা হল। মারামারি করে ছেলের হাতটাই দিল ভেঙ্গে। তখন আবার ভেলোর ছুটতে হল। আল্পনা দণ্ডপাটের কাজের ধরন-ধারণটা রাণুবালা পছন্দ করেন না। তাই বলছিলেন, ''মেয়েমানুষের ছেলেদের সঙ্গে অমন টক্কর দিয়ে কাজ করা উচিত না। তাতে মান, ইজ্জত, সম্ভ্রম কিছুই বজায় থাকে না। আমার সঙ্গে কারুর কখনও এমন ঘটেনি। বছর ত্রিশ আগের কথা। উলুবেড়িয়া স্টেশনের সংগঠনের কাজ থেকে পরিচয়পত্র করলাম। মনে হল, একটু নিরাপদে কাজ করা যাবে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই CITU আর Forward Block-এর মধ্যে প্রবল ঝামেলা শুরু হল। তখন পুলিশ হকার দেখলেই জোরজুলুম শুরু করত, fine করত, case দিত। তবে আমাকে কোনদিন এ'সব ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি। পরিচয়পত্র থাকতে কখনও টিকিট কাটতে হত না। রেলে TT , পুলিশ সবাই বৌদি, বৌদি বলে খুব সম্মান দিত। আজও সেই সম্মানটুকু পাই। লোকে বলে, রাণুবালা যে একতলা বাড়িটা তুলেছেন, তাতে একটাও দুনম্বরি ইট নেই।

ভারতীয় রেলের দেড়শ বছরের ইতিহাস অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী। শুরুর যাত্রাটা যতখানি সহজ ছিল, সময় যত এগিয়েছে, পরিষেবামূলক কাজকর্মেরপরিধিও তত সহজ থাকেনি। সংযোগের দুনিয়ায় নতুন করে বিপ্লব ঘটে গেছে। সময় আর দূরত্বকে এক লহমায় হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে মানুষের জীবন, জীবিকা, বেঁচে থাকার ধরণ - ধারণ, তবু কোথায় যেন অচলায়তনের বাঁধটা আজও পুরোপুরি ভাঙেনি। তাই চল্লিশ বছর আগে যে মানুষটা পাঁচ পয়সার লজেন্স ব্যাগে ভরে শিয়ালদহের লোকাল ট্রেনগুলোতে উঠতেন, আজও তিনি ঐ একই ভঙ্গিমায় বড় কাঁচের বোতলটি সঙ্গে নিয়ে লজেন্স ফেরি করে বেড়ান এই লাইনে। পুরোনো নিত্য যাত্রী ওঁকে অনেকেই চেনেন। নাম রঞ্জিত কুমার ভদ্র। বয়স ষাট পেরিয়েছে। শিয়ালদহ - নৈহাটি লাইনে কম করে হাজার তিনেক হকার কাজ করে (আনুমানিক)। জনা কুড়ি মহিলা হকার, বাকি সবাই-ই পুরুষ। ওঁদের সকলের কথা জানা বা বলার কোনটাই এ সমীক্ষার পরিসরে সম্ভব নয়। চেষ্টা করি রেলের মহিলা হকারের পাশাপাশি দু'একজন পুরুষ হকারের জীবন-কথা জানার। বয়স আর অভিজ্ঞতায় খানিকটা প্রবীণ রঞ্জিত কুমার ভদ্রকে দিয়েই শুরু করি।

বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল না হলেও মোটামুটি খেয়েপড়ে চলে যাচ্ছিল ওঁদের। বাবা তখন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টারিতে চাকরি করেন। মাইনে বেশি নয় ঠিকই তবু তারই মধ্যে লেখাপড়া, সংসার খরচ সব জোটাতে হচ্ছিল। ছোট ছেলেটির পড়ার তেমন মতি ছিল না। তবু কোনক্রমে ক্লাস এইট অবধি গড়ালো। বাবা বললেন, 'employment Exchange'-এ নামটা লিখিয়ে রাখো। এমনিতে তো কিছু জুটবে না। যদি কপাল করে একটা ডাক পাও।" হাতের কাজ্য বিশেষ কিছু জানা নেই। দু'পাঁচ বছর বেকার বাড়ি বসে থাকা আর প্রতিদিনই গঞ্জনা সহ্য করা। ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরিও বন্ধ হয়ে গেছে। এ'সময় কর্মক্ষম বাবার পাশে দাঁড়ানোটা জরুরি। কিন্তু কী কাজই বা পাওয়া যাবে? এ'সব ক্ষেত্রে নিজে কোন ব্যবসা করে দাঁড়ানো ছাড়া গতি নেই। কিন্তু বলবার মতো কিছু ব্যবসা শুরু করতে হলে, হাতে একটা ভাল পরিমাণ পুঁজি থাকা দরকার। সেটাও নেই। পাড়ারই একজন বুদ্ধিটা দিল, 'স্বল্প পুঁজি নিয়ে যদি নামতে চাও, ট্রেনে হকারি কর। কাজের কোন ছোট, বড় জাত নেই।' কথাটা ফেলার নয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা কাজ করছে। বাড়ির কেউ কোনদিন যে কাজ করেনি, সেই কাজটা করার আগে দু'বার ভেবেছিলেন রঞ্জিতবাবু। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগেনি তাঁর ট্রেনের শব্দময়, গতিময় মানব জমিনে পা রেখেই বুঝেছিলেন, চারপাশের বাস্তবটার সঙ্গে তার মত আরো পাঁচটা মানুষ এমনভাবেই লড়াই করছে।

লজেন্স বিক্রির এক অদ্ভুত কায়দা আছে। শুরুতেই খানিকটা ভূমিকা পাড়তে হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুভেদে এই ভূমিকাটা বদলে বদলে যায়। গরমকালে ওঁরা বলেন— 'তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে? খাঁটি আমারে স্বাদ পরখ করুন' কিংবা শীতের সময় বলেন আর চল্লিশ বছর পর চাহিদার বাজারে অনেকটাই ফারাক নজরে আসে রঞ্জিত কুমার ভদ্রের। একটা সময় ছিল যখন পাঁচ পয়সার লজেন্স বিক্রি করে ওঁর ব্যাগ ভরে যেতে। ডাল-ভাত, নুন -ভাতের চিন্তা ছিল না। এখন তাঁর সারাদিনে ১০০ টাকারও বিক্রি হয় না। আসলে তিনি যে লজেন্স বিক্রি করেন, এখনকার বাচ্চারা সে লজেন্স খায় না। বাজারে তাঁর লজেনচুসকে টেক্কা দিতে এসে গেছে ভাল ভাল চকোলেট জাতীয় বিকল্প। তাই আজকাল আর আম, লেবুর স্বাদযুক্ত লজেনচুসের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে বাচ্চারা নজর দেয় না। যারা কেনে, তারা বেশিরভাগই সব বৃদ্ধ মানুষ। বার্ধক্যে এক নতুন শৈশবের জন্ম হয়। তাই রঞ্জিতবাবুর লজেন্সের চাহিদাটা আজ অনেকাংশেই তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাজার বদলালেও, যুগ বদলালেও রঞ্জিতবাবু কিন্তু তাঁর দ্রব্যের প্রকৃতি বদলান নি। সারাদিন ১০০ টাকা বিক্রি হলে ৬০ টাকা মহাজনকে দিতে হয় আর ৪০ টাকা থাকে সংসার খরচের জন্য। ঘরে তাঁর চাল বাড়ন্ত। খাবার যোগাড়ের জন্য প্রতিদিনই টেনশন। ছেলে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে। এদিক ওদিক যোগাড় খাটে। চল্লিশ বছরের এই হকারি জীবনে তিনি খরিদ্দারদের মন বদলাতে দেখেছেন। মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে, পেশা বদলাবেন, কিন্তু যথেষ্ট পুঁজির অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। রবিবারের বাজারটা মাঝে মাঝেই ভালই পান। টাকাপয়সা ধার নিয়ে ব্যবসা চালানোর পক্ষপাতী রঞ্জিতবাবু নন। তাই স্বল্প পুঁজির লজেন্স হকারি ছেড়ে নতুন কিছু করে উঠতে পারেননি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব ভিড়ভাট্টায় আর সেই আগের ক্ষিপ্রতায় কাজ করতে পারেন না। খানিকটা ক্ষোভের সুরেই তিনি বলেন — 'আজকাল ভিড়ভাট্টার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বাচ্চাদের সামনে এসে দাঁড়ালে বাবা, মা-রা ভাবেন, বুঝি ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা ওদের প্রলোভন দেখানোর জন্য সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি।' চেনা পরিচিত কিছু খরিদ্দার আবার নিয়মিতই তাঁর লজেন্স খরিদ করেন। টুকরো টুকরো অনেক ভাল লাগা, মন্দ লাগা স্মৃতি হাতড়ান রঞ্জিতবাবু। নিজে তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি। কিন্তু পরিবারের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। বলেন— ওঁর স্ত্রীর Nursing Training ছিল। কলকাতায় আনন্দ পালিত রোডের একটা Nursing Home-এ অনেক বছর কাজও করেছেন। তিনি। এখন অবশ্য বয়সের ভারে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সাহায্য করে আসেন।Employment Exchange-এ রঞ্জিত ভদ্রের নাম লেখা আছে বহু বছর হয়ে গেল। তবে কখনও কোনো ডাক আসেনি। খালি একবার একবার একটা বেকার ভাতা পেয়েছিলেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে খালি একবাই কারিগরি পদের জন্য একটা ডাক এসেছিল। কিন্তু সে সময় তিনি ইছাপুরে ছিলেন না। খবরটা পান সময় পেরিয়ে যাবার অনেক পরে। সে কথা ভেবে আজও আফশোস হয় তাঁর আফশোস হয় পলতার চাকরিটার কথা ভেবেও। প্যানেলে নাম এসেও রাজনীতির কোনো শক্ত খুঁটির অভাবে ওটাও হাতছাড়া হয়েছিল। তাই রাজনীতি, সরকার, গণতন্ত্র এ'সব নিয়ে কথা উঠলে রঞ্জিতবাবু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বাজার অর্থনীতি নিয়ে তাঁর সোজাসাপটা দৃষ্টিভঙ্গি— ''আমরা খাই জ্যোতি আলু আর বাবুরা খান চন্দ্রমুখী আলু।" চলতি বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না তাঁর লজেন্স -ভর্তি কাচের বয়ামটি। তাই বাজারে দু'টাকার কাঁচা লঙ্কা চাইলে দোকানদার তাঁকে বলে — 'লঙ্কাটা ভেঙে চলে যাও। এই টানাটানির মধ্যেও নিজের ক্ষমতার একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন। এক লক্ষ ষাট হাজার টাকায় রেজিস্ট্রি হল বাড়ি। মেয়েটার বিয়ে দিতে পেরেছেন। তাই এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত। তবে তিনি ভীষণভাবে চান সরকার যেন তাঁদের মত পঞ্চাশোর্ধ্ব রেল হকারদের জন্য বিশেষ কোনো আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন। কোনো বীমা পলিসি করা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই হেসে ফেললেন রঞ্জিতকুমার ভদ্র। বললেন— 'পেটটাই সুরক্ষিত নয়। জীবনটা কীভাবে সুরক্ষিত করব?'

ক্লাস ফোর পাশ। দশ বছর বয়স থেকেই হাওড়া -মেচেদা লাইনে ঘুগনি বিক্রি করেন আনন্দ জানা। তা-ও

প্রায় চৌদ্দ বছর হয়ে গেল এই লাইনে কাজ করছেন তিনি। ওঁর আগে আরও একজন ঘুগনি বিক্রেতা ছিলেন। তবে তাঁর বয়স হয়েছে। এখন আর পারেন না। শুধু ঘুগনি বিক্রি করেই দিনে আড়াইশো-তিনশো টাকা রোজগার হয়ে যায় তাঁর। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভাল, ওঁদের নিজেদের একটা ছোট্ট হোটেল আছে। বাবা আর তাঁর মামাতো ভাই মিলে চালায়। তাই রোজগারের টাকা পরিবারকে সেভাবে কিছু দিতে হয় না। যা আয় হয়, নিজের জন্য খরচা করেন আর বাকিটা সঞ্চয় করতে পারেন আনন্দ। লোহার দোকানে একটা কাজ পেয়েছিলেন। বলেছিল, মাস গেলে শুকনো পাঁচ হাজার টাকা দেবে। কিন্তু সে কাজ নেননি তিনি। বলেছিলেন —'ওতে আমার পোষোবে না। তার থেকে বেশি রোজগার হয় ট্রেনে।' ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু আধুনিক সরঞ্জামও কিনে নিয়েছে আনন্দ জানা। ঘুগনি তৈরির জন্য Mixi Machine , দুটো ওভেন ব্যবহার করেন এখন। সঙ্গে রেখেছেন একটি ছোট ছেলেকে হাতে হাতে সাহায্য করা জন্য। মাস গেলে ছেলেটিকে কিছু দেন।

মাসে মাসে পুলিশ চৌকিতেও কিছু দিতে হয় ওঁদের। হাওড়া থেকে মেচেদা পর্যন্ত প্রায় এগারোটা থানা আছে। মাসে চার, পাঁচজনকে ধরে ওরা। এক-একজন হকারকে এক-এক কারণে case দেয়। কাউকে ladies কামরায় ওঠার নামে, কাউকে পকেটমার বলে। কাউকে আবার রেলচত্বরে প্রকাশ্যে ধূমপানের অপরাধে। এইভাবে নানারকম মিথ্যে case সাজিয়ে কোর্টে চালান করে দেয়। তিনশ থেকে সতেরোশো টাকা পর্যন্ত ফাইন দিয়ে তবে ছাড়া পাওয়া যায়। এটাই এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। রেল পুলিশ আর হকারদের মধ্যে এটা একটা সুষ্ঠু আঁতাত। আনন্দ বলেছিলেন— 'মাসে আমাদের একবার হাজিরা দিতেই হয়। পুলিশরাই বলে দেয়, কার কবে পালা। সেইমতো আমরা হাজিরা দিই। প্রত্যেক মাসে ওরা চার-পাঁচজন্যক case দেয়। এটা যেমন ওদের duty, আমাদের duty ওনাদের কথামত একবার দেখা দেওয়া। বে হকারি করছি বলে রেলপুলিশ কোনো case সাজায় না। রেলের আইনি কোনো অধিকার নেই যে হকার হিসাবে আমাদের ধরবে। তাই অন্য কারণ দেখিয়ে। '৯৯ সালের আগে পর্যন্ত এত ধরপাকড় ছিল না। আমি তখন কোন case পাইনি। ২০০১ সালের পর থেকে case দেওয়ার হারটা অনেক বেড়ে গেছে। আসলে এই case খাওয়াটা একটা মজার খেলা। ওদের নিয়ম হচ্ছে, মাসে চার-পাঁচ জনকে ধবে। নতুন মুখ হলে একটু বেশি হেনস্থা করবে আর পুরোনো চেনা মুখ হলে কোর্ট চালান আর তারপর ফাইন। ধরা যাক ০১.০১.০৮ -এ কাউকে case দেওয়া হলো। তারপর উপর এই case থাকবে ০২.০২.০৮ অবধি। একবার হাজিরা দিতে পারলে বাকি দিনগুলো নিশ্চিন্তে কাজ করা যায়। তখন আর কেউ কিছু বলবে না। রেল হকার হিসাবে ওঁদের কোন Monthly নেই। কিন্তু Hawkers Union -এর কার্ড আছে। এই কার্ডটা থাকতে ফেরি কাজে একটু সুবিধা হয়। TT ধরে না। ওরা যে কোনো বগিতেই কাজ করতে পারেন। সারা দিনে ১০-১১ বার লোকালগুলোতে trip দেন আনন্দ। তিন-চারবার বড় case ও দিয়েছে পুলিশ তাঁর নামে। সতেরোশো থেকে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানাও দিতে হয়েথে। তবু পুলিশকে দিয়ে, সব খরচা বাদ দিয়েও ভালভাবে চলে যাচ্ছে। সব সিজেনেই ওঁর ঘুগনির চাহিদা ভাল। তাই আর অন্য কোন কাজে যেতে চান না আনন্দ জানা। পুলিশি ধরপাকড় ছাড়া আর অন্য কোনো সমস্যা হয়নি এতদিনে। তবে case -এ ধরা পড়ার ব্যাপারটা বাড়িতে বিশেষ কেউ-ই জানে না। এক দিদি আছে ওঁর। মাধ্যমিক অবধি পড়াশুনা করেছে সে। জামাইবাবুও প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। হকারি করেন বলে খানিকটা লজ্জায় ওদের বাড়ি তেমনভাবে যান না। এই পেশার আইনি স্বীকৃতির প্রশ্ন উঠলে আনন্দ বলেন— ''সরকার Licence দিয়ে ফেললে লোকাল ট্রেনে আর চলাফেরার জায়গা থাকবে না। যাত্রীদের সমস্যা আরো বাড়বে। তবে আমরা বর্তমান যারা আছি, তারা প্রত্যেকেই চাই রেলকে মাসিক একটা খাজনা স্বরূপ কিছু দিয়ে বৈধ উপায়ে রোজগার করতে। এতে সরকারেও লাভ হবে আর আমরাও পুলিশের জোরজুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবো।' ঘুগনি আর রেলপুলিশের গল্প শুনতে শুনতে হাওড়া পৌঁছে গেলাম। কিন্তু ওঁর দু'টাকার ঘুগনিটা আর খাওয়া হল না। পরে কোনদিন এই লাইনে আনন্দ জানার সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই পরখ করে দেখব।

নব্বই-এর দশকের গোড়ার কথা। কাজের বাজারের সংকটটা আরো বাড়ছে। কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলো যেন পহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকরা অধিকাংশই টিউশন পড়ানোটাই উপার্জনের একমাত্র উপায়ে নেমেছে। অল্প অল্প করে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ কাজের বাজারে সম্প্রসারণের তেমন কোন লক্ষণ তখনও দেখা যায়নি। তেমন কোনো ভাল কাজের সন্ধান না পেয়ে অক্ষয় সাহাও প্রথম জীবনে টিউশন পড়ানো শুরু করলেন। নিজের ক্লাস এইট পাশ। ছোট ছোট বাচ্চা পড়িয়ে তখন মাস গেলেও ৫০-৭০ টাকা মাইনে। সারাদিনে পাঁচ বাড়ি পড়িয়ে মাসে তাই ৩০০-৪০০ টাকার বেশি আয় হয় না। সংসার চলা দায়। যৌথ পরিবার। তবু সবকিছুতেই খরচের ভাগীদার হতে হয়ে। ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন যে শুধু টিউশন করে চলবে না। এমন একটা কাজের ক্ষেত্র খুঁত্র খুঁজতে হবে যেখানে যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষার স্বল্প পুঁজি নিয়েও একটু বেশি রোজগার করা যায়। প্রথমেই একটা ছোটখাটো ব্যবসা করার কথা মাথায় আসে, কিন্তু তার জন্য চাই একটা জমি, বেশ খানিকটা পুঁজি আর যে আর কয়েকশো মানুষকে একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া। খালি জানতে হবে বিক্রয় সম্ভাবনা তৈরির কৌশল। হ্যাঁ, হকারির কথাই সেদিন ভেবেছিলেন অক্ষয় সাহা। দীর্ঘ পনেরো বছর হতে চলল এই লোকাল ট্রেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তিনি। শীর্ণকায় ছিপছিপে চেহারা আটত্রিশেই যেন খানিকটা বুড়িয়ে

গেছেন। রাণাঘাট স্টেশন থেকে সেদিন প্রথম এক প্যাকেট লজেন্স নিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রেলের আইন নাকি আগে খুব কড়াকড়ি ছিল। তাই খুব কম সংখ্যক হকারই ওই লাইনে কাজ করতেন। পুরুষ হকার যাও-বা ক'জন ছিল, মহিলা হকার প্রায় নজরেই পনত না। দু-একজনকে দেখা যেত সাকসবজি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসতে। এখন যেমন বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা হকারকে লোকাল ট্রেনের মহিলা বগিতে দেখা যায়। বছর পনেরো আগেও জীবিকা নির্বাহের জন্য এই পেশায় তাঁদের বিশেষ পাওয়া যেত না। একচ্ছত্রভাবে অক্ষয় সাহা, সলিল হালদার, রঞ্জিত ভদ্ররা তখন কাজ করে গেছেন। লজেন্স বিক্রির কাজটা দেখছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষরাই করে থাকেন।

বছর বাঁচেক লজেন্স বিক্রির পর অক্ষয় সাহা তাঁর ব্যবসা বদল করেন। শুরু করলেন মনোহারি দ্রব্যের এ'কারবার। আগে দিনে ৪০-৫০ টাকা বিক্রি হত। মনোহারি ফেরি করে উপার্জন খানিকটা বাড়ল। সেই থেকেই শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনে মনোহারি জিনিসই ফেরি করছেন করছেন উনি। এই ব্যবসায় তাঁর দিনে দু'শ-তিশ টাকার পুঁজি লাগে। সারাদিনে দু'শ টাকার মাল বিক্রি হলে একশ টাকার নতুন পুঁজি লাগাতে হয় আর একশ টাকা রাখেন সংসার খরচার জন্য। মানুষের নজর বদলে গেছে। একটু ভাল মানের জিনিস ছাড়া এখন আর কেউ কিনতে আগ্রহী হয় না। আবার একটু ভাল জিনিস রাখতে হলে বেশি পুঁজির দরকার হয়। বেশি পুঁজি করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁর নেই। ব্যাঙ্কেও টাকাপয়সা বিশেষ জমাতে পারেনি। খালি মেয়ের নামে একটা জীবনবীমা করিয়েছেন। সারাদিনের অর্ধেকটা সময় তাঁর ট্রেনেই কাটে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরেন। যেদিন দুপুরের মধ্যে সব মাল বিক্রি হয়ে যায়, সেদিন অবশ্য বিকেলের মধ্যেই চলে যান। কখনও আবার নতুন করে মাল তুলে বিকালের গাড়িগুলো ধরেন।

যত দিন যাচ্ছে, অক্ষয় সাহার মত মানুষেরা নিজেদের এই পেশাটিকে নিয়ে নিরাপত্তহীনতায় ভুগছেন। প্রতিটি দিনই অনিশ্চয়তার মধ্যে ওঁদের থাকতে হয়। বহুদিন আগে exchange-এ card করিয়েছিলেন। কিন্তু রঞ্জিত ভদ্রের মত তিনিও কোন ডাক পাননি আজও। তবে এখনও মনে ক্ষীণ আশা আছে, যদি call আসে। সারাদিনের বিক্রিবাট্টার শেষে হাতে একশ-দেড়শ টাকা থাকে। এরই মধ্যে পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখের খরচ চালাতে হয়। পড়াশুনার খরচ বলতে ছেলে-মেয়ের Tiffin খরচ, tuition -এর খরচ, স্কুলে কখনও সখনও অনুষ্ঠান হলে সেই খরচ। এ'সবের যোগান দিতে হিমসিম খেতে হয় তাঁকে। আর্থিক সহযোগিতার জন্য তাঁর স্ত্রীও ঘরে বসে সেলাই-এর কাজ করেন এখন। পারিবারিক সূত্রে একটা ছোট জমি পেয়েছেন অক্ষয় সাহা। ইচ্ছা আছে। ঐ জমিটা কাজে লাগিয়ে একটা ব্যবসা করার। তার জন্য Bank থেকে loan করারও চেষ্ঠা চালাচ্ছেন। অবসর বিনোদন বলতে খবরের কাগজ পড়া। ফাঁক পেলেই ইউনিয়ন অফিসে এসে কাগজটায় চোখ বুলিয়ে যান। সোম থেকে রবিবার পুরোটাই যেহেতু কাজের দিন, তাই পরিবার - পরিজনকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয় না তাঁর। ঘুরতে গেলেও তো পয়সার দরকার। সে কাঁচা পয়সা হাতে নেই। ''বিক্রি না হলে খাব না''— সম্পূর্ণ এই নীতিতে বিশাসী অক্ষয়বাবু তাই দৃঢ়কণ্ঠে বলেন —''দেশের উন্নতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।''

ডাউন শান্তিপুর লোকাল আসছে। চায়ের ভাঁড়টা ফেলেই অক্ষয়বাবু মালের বোঝাটা কাঁধে তুলে নেন। মহিলা বগির পা-দানিতে কোনো মতে একটা পা ঠেকিয়ে ঝুলে পড়েন অক্ষয় সাহা।

লোকাল ট্রেনের ভিড়ে এমন অনেক অক্ষয় সাহার কাহিনি লুকিয়ে আছে যা একদিনে শেষ করা যাবে না। ঐ মানুষগুলোর জীবন বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য খুবই কম। তাই গল্পগুলোও মনে হয় একই ছাঁচে গড়া। তবু তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে সংগ্রামের নিজস্ব একটা রাজনীতি আছে। আপাতভাবে যেটা চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।

কাঁটাপুকুর আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনের শিক্ষিকা দীপা দে-র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হাওড়া-খড়গপুর লাইনেই। রেল এবং রেল হকার নিয়ে নিত্যযাত্রীদের অনেক বক্তব্য। তাঁর কাছ থেকে রেল হকার সম্পর্কে পেয়েছিলাম বেশকিছু অজনা তথ্য। আমি যেহেতু নিত্যযাত্রী নই, তাই রেলের ভিতর ও বাইরেটা নিয়ে চট করে কোনো গভীর ভাবজট দানা বাঁধে না। তাই দীপা দে'র কথাগুলো আমার কাছে বেশ যুক্তিপূর্ণ এবং নতুন মনে হয়েছিল। উনি স্পষ্টতই বলেছিলেন —'ট্রেমের মহিলা বগিতে রেল হকার থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। এতে আমরা নিজেদের অনেক বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করি। শুধু তাই নয়। এঁরা এখন অনেক জিনিস বিক্রি করেন, যেটা আমরা স্থানীয় বাজারে খুঁজলেও পাই না। অনেকেই আছেন যাঁরা বিশেষতঃ ঘরে তৈরি কিছু জিনিস বিক্রি করেন, যেমন বড়ি, আচার, চালের পাঁপড়, নাড়ু, বিশেষ স্বাদযুক্ত কোনো হজমি, আমলকি। এগুলোর কোন ব্রান্ড নেই। সাধারণ দোকানে বাজারে পাওয়া যায় না, অথচ চাহিদা আছে। এছাড়া বিশেষ কোনো উৎসব, অনুষ্ঠানের জরুরি জিনিসের যোগানও রেল হকাররাই দেন— এই যেমন পুজোর সময় নারকোল, লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু, শীতকালে গরম জামাকাপড়। দৈনন্দিন হাজারো টুকিটাকি জিনিস, যেগুলো আর সময় নষ্ট করে বাজারে, দোকনে কিনতে যেতে হয় না। আসতে যেতে হাতের কাছেই পেয়ে যাই আমরা। এমন এক এক ধরণের শাকপাতা, সবজি নিয়ে ওঁরা ওঠেন, যেগুলো বাজারে বিশেষ নজরে পড়ে না কিংবা আমরা চিনি না। স্থানীয় হাটে বিক্রি করে, বাড়ি ফেরার পথে ওঁরা সস্তায় আমাদের ট্রেনে বিক্রি করে দিয়ে যান। এমনকি, কীভাবে রাঁধতে হবে, সেটাও শিখিয়ে দেন। আসতে, যেতে এমনই আত্মিক সম্পর্ক হয়ে যায় মাঝে মাঝে যে ফাঁকা ট্রেনে নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প জুড়ে দেন ওঁরা আমাদের সাথে সাথে। ওদের কথা শুনতে শুনতে বুঝি, আয়-উপার্জন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে এরা

স্বাধীন নন। " দীপাদের কথায়, লোকাল ট্রেন, হকার আর আমরা যাত্রীরা সব পরস্পরের ভরসায় বেঁচে আছি। হকার বিনা তাই লোকাল ট্রেনের কামরাগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে উঠবে। রেল পরিষেবার সঙ্গে হকার এবং যাত্রী জীবনের এক অন্য ইতিহাস জড়িত। তাই নিত্যযাত্রীর জীবনচর্যায় হকারসখা উঠে আসেন অন্য আঙ্গিকে। আইন আবার বলে অন্য গল্প। রেল হকারদের থাকা না থাকা নিয়ে নানাজনের নানা মত। কথা হয়েছিল রেলের জনসংযোগ আধিকারি সমীর কুমার গোস্বামী মহাশয়ের সহেগ। হকার প্রসঙ্গটা তিনি সম্পূর্ণ আলোচনা করেছিলেন প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে। তাঁর মতে রেলের কামরায় হকারদের এই দৌরাত্ম্য তথা বাড়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের এক্তিয়ার রেল কর্তৃপক্ষের নেই। রেলের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ভার অর্পিত G.R.P-এর হাতে। আর রেল এবং রেল পুলিশ সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। তাই রেল বগি কিংবা প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন অঞ্চলটি হকারদের দ্বারা অবৈধভাবে অধিকৃত হলেও ভারতীয় সংবিধানের ধারা বলে রেল যেহেতু পৃথকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বখানি নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। তাই হকার প্রসঙ্গে রেলের কিছু করণীয় নেই। আইনশৃঙ্খলার দিকটা দেখবে রাজ্য রেল পুলিশ। অবশ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষণের ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই পৃথক ক্ষমতা প্রয়োগের দাবি জানিয়ে আছে। কিন্তু এখনও সেই রকম কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি যেখানে রেল স্বতন্ত্রভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষণ, অবৈধ বেসাত বন্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। ফলে স্বতন্ত্র ভূমিকা ও যৌথ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রেল ও রেল পুলিশের মধ্যে আজও কোন সুষ্ঠু সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সমীরবাবুর বক্তব্য — রেল পুলিশ তার কর্তব্য যথাযথ পালন করছে কিনা সেটা নিরীক্ষণের কাজ যেমন রেল কর্তৃপক্ষের নয়, তেমনই রেল যথাযথভাবে যাত্রী পরিষেবার দিকটি বজায় রেখেছে কিনা সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আইনি এক্তিয়ারও রেল পুলিশের নেই। যুগ্ম দয়িত্বেরই বন্ধনে যেহেতু বাঁধা নেই ফলে রেল ও রেলপুলিশ একে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়েই খালাস। আর আইনের এই ফাঁকা গলেই হকাররাজের বাড়বাড়ন্ত। একজন পদস্থ আধিকারিক হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে সমীর কুমার গোস্বামী যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, 'হকার' দৈনন্দিনের এই সমস্যা সমাধানের চটজলদি কোন রাস্তা তাঁদের জানা নেই। প্রত্যেকে কেবল যে যাঁর নিজের এরিয়াটুকু বুঝে নিতে মরিয়া।

2nd year English Hons. রোজিনা খাতুনও চান হকার থাকুক কিন্তু পরিমিত। প্রতিদিন শহরতলির লোকাল ট্রেনগুলিতে অনিয়ন্ত্রিত যাত্রীচাপ, তার উপর হকারের সংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পেলে ট্রেনে যাত্রীদের অসুবিধা আরো বাড়বে।

রেল হকার নিয়ে কৃষ্ণা মান্না, প্রীতিলতা চৌধুরী কিংবা সাগরিকা মালাকাররা অবশ্য একটু অন্য কথা বলেন। তাঁর চান, মহিলা বগিতে শুধু মহিলা হকাররাই উঠুক। মহিলা বগিতে পুরুষ হকার উঠলে সেটা একটু সমস্যা তৈরি করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী তৃষা মান্না আবার এই পেশার বৈধতা, অবৈধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে অভিমত দিলেন যে, 'সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে।' B.C.A পাঠরতা সুইটি সরকার, সংখ্যনিতা দিন্দা, কিংবা স্নাতকোত্তর (ইংরাজি) পর্যায়ের ছাত্রী পিয়ালী পাল একবাক্যে সমর্থন করলেন তৃষার মত। মহিলা কিংবা পুরুষ কোন হকারেরই আর উপার্জনের পথটা বন্ধ হওয়া সমর্থন করেন না ওঁরা। সেই সঙ্গে অবশ্য এটাও চান যে রেল হকারের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হোক। সংখ্যা বেঁধে দিলে বাকিরা কোথায় কাজ পাবেন, সে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে অবশ্য এঁরা কোন স্বচ্ছ ধারণা পারেনা। কলেজ ছাত্রী রঞ্জিত কাউর অবশ্য বলেন, ওঁদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য আরো বেশি করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃদ্ধির দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভারি শিল্পে কর্মনিযুক্তির জন্য যেটুকু শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, সেটা এঁদের কারুরই নেই।

বেশকিছু যাত্রীর কাছে অবশ্য ট্রেনে হকারের উপস্থিতিটাই যথেষ্ট আপত্তিকার। পেশায় চিকিৎসক (নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক) কয়েকজন মহিলা যাত্রী মনে করেন, লোকাল ট্রেনে হকার থাকলে যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত হয়। তাই লোকাল ট্রেনে এই কাজ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। পুনর্বাসন দিতে হলে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এঁদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করা হোক। সেক্ষেত্রে ট্রেন থামলে তাঁরা এইটুকু সময়ের জন্য রেলের দরজায় এসে বিক্রি করুন, আপত্তি নেই। তাঁদের এই আদর্শায়িত ভাবনার বাস্তব রূপটা কেমন হবে, তা আমার জানা নেই। তবে যাত্রী সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটা উচ্চশিক্ষিতা সেই মহিলারা সেদিন যত্নেই এড়িয়ে গেছিলেন।

সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ, পরিষেবা, ফেরি কাজের বৈধতা, অবৈধতা এসব নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। যতদিন রেলগাড়ি চলবে, আমরা নিত্যযাত্রীরা লোকাল ট্রেনে বাদুড় ঝোলা করে ঝুলব আর রেল হকারের হাঁকডাক থাকবে, ততদিনই এই বিতর্ক চলবে। তবে রাতারাতি যে কিছু বদলাবে না, সেটা ওঁরাও জানেন আর আমরাও জানি আর জানি বলেই প্রতিদিনের চেনা ছবিটা কল্পনা করে নিয়েই ৯:২০-এর লোকালটার জন্য দৌড়াই।

মুখের কথায় ওঁদের জীবন ইতিহাস শুনতে শুনতে জনা ষাটেক মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে গেছিল। ওঁর সবাই-ই ছিলেন হাওড়া-শিয়ালদা লাইনের রেল হকার। যাত্রী হিসাবে নয়, একজন অনুসন্ধানকারী হিসাবে খোঁজখবর নিতে গিয়ে পুরোদস্তুর কথক বনে গেছি। তবে আমার গল্পে বারবারই উঠে এসেছে মেয়েদের কথা। রেলের 'মহিলা ফেরিওয়ালি'র সংখ্যাটা আজও পুরুষের অনুপাতে নিতান্তই কম। তবু নির্বাচিত প্রকল্পের সীমায়িত পরিধি স্মরণে মালতী চৌধুরী, মীনা বেগম, শ্যামলী কয়াল কিংবা অঞ্জলি দেবনাথদের জীবনকথা বিস্তৃত পরিসরে

আনা গেল না। শেষ করব এমন একজনের কথা দিয়ে যিনি আক্ষরিক অর্থে রেলহকার নন, কিন্তু রেল স্টেশনকে অবলম্বন করেই তাঁর বেঁচে থাকা, বড় হওয়া, জীবিকা সবকিছু।

হালিমা মণ্ডল। বয়স ২৭-এর কাছাকাছি। ঠিকানা নৈহাটি স্টেশন। আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশে। দেশভাগের সময় এদেশে চলে আসে ওঁর পরিবার। তারপর থেকেই এই স্টেশনই ওঁদের ঘরবাড়ি। সরকারি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি অবধি পড়াশুনাও করেছে হালিমা। তারপর বিয়ে হয়ে যায়। তখন বয়স চৌদ্দ। স্বামী রিকসা চালাতেন। বছরপাঁচেক আগে ছেড়ে যায় হালিমাকে। তারপর থেকেই স্টেশনের দোকানে, দোকানে জল দেওয়া আর ধোওয়া-মাজার কাজ ধরেন হালিমা মণ্ডল। আগে ওঁর মা করতেন। মা-ই ওঁকে কাজটা ধরান। এই স্টেশন চত্বরে এখন ছয়-সাতটা দোকান ধরা আছে ওঁদের। ভোর হতে না হতেই দোকানের কাজ শুরু করেন ওঁরা। দুপুর একটা-দেড়টার মধ্যে সবার কাজ সেরে দিয়ে চলে যান। দুপুরের রান্না, খাওয়া সেরে আবার চলে াসেন সন্ধ্যাবেলায়। রোজকার এই এক রুটিন ওঁদের। দু'বেলা কাজের শেষে কেউ কুড়ি টাকা, কেউ-বা পাঁচ টাকা দেয়। যার যেমন দোকান তাঁর কাছে তেমন মজুরি মেলে। নৈহাটি স্টেশনে হালিমা আর তাঁর মা ছাড়া এই কাজ আর কেউ করে না। উদ্বাস্তু হয়ে থেকে গেছেন ওঁরা। আজও তই নিজেদের কোন রেশন কার্ড কিংবা ভোটার কার্ড নেই ওঁদের। রোজের হিসাবে দোকানদাররা যা দেয়, তাই দিয়েই মা-মেয়ে আর ছয় বাচ্চার ভরণপোষণ চালাতে হয়। দুজনে মিলে হাজার থেকে তিন হাজার আয় করেন। বাচ্চাগুলো তার AIDS সচেতনতা কেন্দ্রের স্কুলে পড়ে। লোকাল ট্রেমে হকারি করার কথা কখনও ভাবেননি হালিমা মণ্ডল। মাল কিনে বেচতে গেলে যেটুকু সামান্য পুঁজি লাগে, তা-ও নেই। কাজেই গায়েগতরে খেটে যতদিন চালাতে পারবেন, ততদিনই চলবে। এই কাজের জন্য তাঁদের অবশ্য পরিচয়পত্র লাগে না। সংগঠনের কাজ থেকে সেভাবে সাহায্যও নেননি ওঁরা। বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভেবে উঠতে পারেন না হালিমা মণ্ডল। তবে দিনেরটা দিন ভাবতে গিয়ে ওঁদের মনে হয়, স্টেশন চত্বরে দোকানগুলো যদি সরকার কোনদিন তুলে দেয়, তবে তো ওদেরও কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ওঁরাও চান, রেল হকারদের জন্য সরকার পাকাপাকি কোনো বন্দোবস্ত করুক। আসলে ওঁদের জীবন আর জীবিকা একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। তাই পুরো ব্যবস্থার কোন একটি অংশের উপরে আঘাত এলে অন্য অংশটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই সহজ সত্যটুকু হালিমা মণ্ডলেরা বোঝেন। নিজের গবেষণার গরজে এইসব মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার-এর একটা উক্তি নিজের উপর খুব প্রযোজ্য মনে হল। সেই উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করি ফেরিকথার প্রথম কিস্তি— ''আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ এক বড় ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে রাজনৈতিক নেতা, আমলা, পেশাদার, সমাজবিজ্ঞানী সকলেই সুবিধা তোলেন। গরিবদের অবস্থায় কোনও রদবদল ঘটে না।''